ছোটদের বন্ধু

কবি জসীম উদ্‌দীন

এ. এন. সালামত উল্লাহ

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের বন্ধু

কবি জসীম উদ্‌দীন

এ. এন. সালামত উল্লাহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

ছোটদের বন্ধু কবি জসীম উদ্‌দীন
এ. এন. সালামত উল্লাহ্

ইফাবা প্রকাশনা : ১৫৪২/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৯২৮.৯১৪৪
ISBN : 984-06-0563—0

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৮৮

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০১
আষাঢ় ১৪০৮
রবিউল আউয়াল ১৪২২

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৬.০০ টাকা মাত্র

CHOTODER BANDHU KABI JASEEM UDDIN (Poet Jaseem Uddin, the Friend of the Children): written by A. N. Salamat Ullah in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2001

Price : Tk 16.00 ; US $ Dollar : 0.75

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

যাঁদের স্নেহাতিশায্যে আমার সারাজীবন
কেটেছে সেই শ্রদ্ধেয় আব্বা ও
আম্মার হাতে তুলে দিলাম।

—লেখক

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

কবি জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট কবি। পল্লীকবি হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। পল্লী বাংলার মানুষের জীবনের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্যে রূপ পেয়েছে, লোক-ঐতিহ্যকে তিনি আধুনিক সাহিত্যে পরিবেশন করেছেন সার্থকভাবে।

কবি জসীম উদ্‌দীনের জীবনের নানা দিক গল্পাকারে ছোটদের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন লেখক এ. এন. সালামত উল্লাহ্ তাঁর 'ছোটদের বন্ধু কবি জসীম উদ্‌দীন' বইটিতে। বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৮৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি এবারও বইটি আগের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

facebook/@maktabatuttalamij

সূচিপত্র

পল্লীকবি	৯
কবির জন্ম	১০
ফেলে আসা দিনগুলো	১১
মায়ের স্নেহের অন্তরালে	১১
হানিফ মোল্লার সাথে কবি	১৩
কবিগানের আসরে	১৫
প্রথম কবিতার সাধ	১৬
উত্তম সেবক	১৭
প্রথম স্কুল যাত্রা	১৯
শিক্ষাঙ্গনে	২০
সাহিত্য সাধনায়	২০
পল্লীকবি নামের সার্থকতা	২২
শিশুদের কবি	২২
প্রথম শিশু কবিতার বই	২৪
কর্মজীবন	২৫
নজরুলের সাথে	২৫
বিদেশ সফর	২৬
সাহিত্য মজলিসে	২৭
চিরবিদায়	২৮

facebook/@maktabatuttalamij

"নব মঞ্জুরী ধরিয়া কণ্ঠে ফসলেরা দোল খায়,
প্রজাপতি নাচে মাথার উপরে পাখিরা উড়িয়া যায়।
চাষীদের মনে কত আনন্দ আর কয়দিন পরে,
নতুন ধানের হবে উৎসব সকলের ঘরে ঘরে।"

জসীম উদ্‌দীন

facebook/@maktabatuttalamij

“পাল-পাড়াতে কলেরাতে মরছে লোকে দিনে রাতে,
বোস-পাড়াতে বসন্ত আজ দিচ্ছে বড়ই হানা,
আমার মাথার দিব্যি লাগে ঘরটি ছেড়ে—
যাসনে কোথাও ভুলি’ মায়ের মানা।

খোকন তখন লাফিয়ে উঠে, ওষুধ লয়ে যায় যে ছুটে,
পাল-পাড়াতে দিনে রাতে রোগীর সেবা করে ;
মরণ-মুখো রোগী তখন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে
ফেরেস্তা কে ব’সে আছে তার শিয়রের ‘পরে !
মুখের পানে চাইলে তাহার, রোগের জ্বালা
যায় যে দূরে স’রে।”

জসীম উদ্‌দীন

facebook/@maktabatuttalamij

পল্লীকবি

"আমি এক সহজ-সরল ছেলে। গ্রামেই কেটেছে একেক করে আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবন। গ্রামের মাঠ-ঘাট, নদী-নালা, গাছ-পালা ও মানুষজন সবই আমার বড় আপন। তাই আমি মায়ের মত ভালবেসে উজাড় করে দিয়েছি আমার সব মায়া-মমতা-ভালবাসা। আমার সারা অঙ্গে আজো লেগে আছে বনের লতা-পাতা ও মাটির গন্ধ। গ্রামের সরল-সহজ মানুষদের নরম ভালবাসার পরশ আমার সকল অস্তিত্বে প্রবাহিত হচ্ছে অবিরত। তাদের অকৃত্রিম ভালবাসায় নিজেকে গড়ে তুলেছি তাদেরই একজন করে। তাদের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্নায় আমি মিশে গেছি এক হয়ে। তাই বলতে ইচ্ছা করে আমি হারিয়ে গেছি গ্রামের মাঝে, গ্রাম হারিয়ে গেছে আমার মাঝে।"

উপরের কথাগুলো বলেছিলেন তোমাদের অতি পরিচিত এক খ্যাতনামা কবি। তোমরা মনে মনে হয়তো এতক্ষণে সে কবিকে চিনতে চেষ্টা করছো। আর হ্যাঁ, তাঁর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উল্লেখ করলেই তাঁর সাথে পরিচিত হতে আর একটু সুবিধে হবে। তাই না ? কবিতাটি এই ঃ

"যাবে তুমি ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গাঁয়
গাছের ছায়ায় লতায়-পাতায় উদাসী বনের বায়
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি
মোর গেহখানি রহিয়াছে ভরি।"

এবার নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছো। তিনি হচ্ছেন শিশুদের প্রিয় কবি। পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন। সত্যি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ ও সরল, সাদাসিধেভাবে চলাই ছিলো তাঁর গর্ব। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তোমাদের মত বন্ধুদের কখনো ভোলেননি। আর হ্যাঁ, তোমাদের জন্য লিখেছেন নানা ধরনের ছড়া, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ। ফলে, তোমরা আজ তাঁর এত মজার মজার কবিতা-গল্প পড়ার সুযোগ পাচ্ছ।

facebook/@maktabatuttalamij

তাইতো তিনিও তোমাদের কাছে হয়ে উঠেছেন খুব প্রিয়। সবাই সে কথা একবাক্যে স্বীকার করবে, তাই না?

সাধনার সিঁড়ি বেয়ে মানুষ অনেক উপরে উঠতে পারে, তার স্বাক্ষর রেখেছেন পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন। কবির প্রতিটি কবিতায় বাংলার প্রকৃতির রূপ অপরূপ মাধুর্যে ফুটে উঠেছে। তিনি দরদ ও সহানুভূতির পরশ বুলিয়ে গ্রাম-বাংলার প্রকৃত ছবি তুলে ধরেছেন। তাইতো বাংলার মানুষ তাঁকে উপাধি দিয়েছে পল্লীকবি।

শিশু সাহিত্যেও তিনি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তাই শিশুমহলে জসীম উদ্‌দীন এত পরিচিত।

কবির জন্ম

ফরিদপুর শহরের কিছু দূরে ছোট্ট একটি গ্রাম, নাম তাম্বুলখানা। এই গ্রামেই ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসে জন্মগ্রহণ করেন আমাদের প্রিয় কবি জসীম উদ্‌দীন। বাড়িটা ছিলো তাঁর মামার। জীবনের কিছুদিন কেটেছে এখানেই। জঙ্গল, আগাছায় গ্রামের চারদিক ছেয়ে ফেলার ফলে গ্রামের সৌন্দর্য অনেকটা মলিন হয়ে এসেছিলো, যা মানুষ বসবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেই সাতটি পরিবার কোনরকম বসবাস করতো। মামার বাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি একদিন মাকে বলেছিলেন, “মা! বলতো সেই বুনোদেশের মেয়ে তুমি কি করে আমাদের বাড়ি এলে? কে ছিলো সেই বিয়ের ঘটক?” কবির এ রসিকতা উপভোগ করার মত। তবে কবির জীবনের কিছু অংশ এ গ্রামেই কেটেছিলো। তারপর একদিন কবি ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় পিতৃগৃহ গোবিন্দপুরে। গোবিন্দপুরে কেটেছে জীবনের আনন্দঘন অংশটি। গ্রামটি ছিল অপূর্ব ; যেন ছবির মত। চারদিকে সবুজের মাতামাতি। সেখানে সারি সারি বনবীথি। পথের দু'ধারে থরে থরে সাজানো গাছপালা, পাশে ধানক্ষেত যেন সবুজের মেলা, তারই পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে রূপালী নদী। ভোরের সোনামাখা রোদ গ্রামটিকে সোনালি রঙে রাঙিয়ে তোলে। রাতের জ্যোৎস্নালোকে গ্রামটির রূপ যেন অপরূপ হয়ে ধরা দেয়। এই রূপ দেখতে দেখতে হারিয়ে যেতেন কবি। তাইতো গ্রামটি ছিলো তাঁর এত প্রিয়।

facebook/@maktabatuttalamij

ফেলে আসা দিনগুলো

মানুষের জীবন সময়ের কাছে বন্দী। এর মাঝে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ এগিয়ে যায়। বাঁচার জন্য করতে হয় কাজকর্ম। বলতে হয় নানা ধরনের কথাবার্তা।

মানুষের জীবনের প্রথম ভাগের কিছু কথা, কিছু কাজ কর্মময় জীবনের ফাঁকে ফাঁকে মনের দোলনায় দোল দিয়ে যায়। তা-ই হচ্ছে শৈশব স্মৃতি। শৈশবের স্মৃতিগুলো মানুষকে হাসায়-কাঁদায় আবার বেশ শিহরণ জাগায়। ঠিক তেমনি কবির মনের আয়নায় ধরা পড়ছিলো এক এক করে সেই মধুমাখা ফেলে আসা দিনগুলো।

কবির ফেলে আসা বিগত দিনগুলোর কিছু কথা, কিছু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে তোমাদের শোনাবো। কবির শৈশব স্মৃতি বেশ মধুর ও আনন্দময় যা তোমাদের শিশুমনের আনন্দের খোরাক যোগাবে। তাহলে শোনো কথাগুলো ঃ

মায়ের স্নেহের অন্তরালে

অভাব-অনটনের মধ্যদিয়ে কোনরকম কবির দিনগুলো কাটছিলো। এত টানা-হেঁচড়ার সংসারেও ছেলেমেয়েদের প্রতি মা-বাবার স্নেহের কমতি ছিল না। জসীমের 'মা' রাঙা ছুটু জসীমকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। মায়ের ভালবাসা পেয়ে দিনের পর দিন তাঁর চঞ্চলতা বেড়েই চললো। দুষ্টুমি যতই করুক না কেন মা'র প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা ছিলো। তার পরিচয় মেলে সেখানে, যখন তিনি তাঁর মাকে তাঁর কাজের সময় সাহায্য করতেন।

পিঠার গন্ধ কবিকে পাগল করে ফেলতো। 'মা' যখন পিঠা বানানোর আয়োজন করতেন, তখন আর তাঁকে পায় কে? সারারাত মা'র পাশে বসে বসে পিঠা বানান দেখতেন, আর প্রহর গুণতেন কখন পিঠা বানানো শেষ হবে। মাকে চুপি চুপি বলতেন, 'মা, কখন পিঠা হবে?' খুব নরম গলায় মায়াময় দু'চোখ তুলে মা স্নেহমাখা কোমল সুরে ছেলেকে বলতেন, একটু সবুর কর বাবা এই বলে মা তাঁকে পিঠা নামিয়ে দিতেন। আর ছোট্ট জসীম করতো কি জানো? আনন্দে নাচতে নাচতে পিঠাগুলো খেয়ে ফেলতেন।

facebook/@maktabatuttalamij

মাকে খুশি করার জন্য তাঁর চেষ্টার কমতি ছিলো না। মনে মনে নানা বুদ্ধি আঁটতেন। চাচাতো ভাই নেছারকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন বাড়ি থেকে। চলে যেতেন নিজ গ্রাম পেরিয়ে নদীর ওপারে। নানা রংয়ের ফুল-ফল, লতা-পাতা নিয়ে মনের আনন্দে খেলতেন। ক্ষেত হতে শামুক কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছিদ্র করে মালা গেঁথে কোমরে জড়িয়ে দৌড়-পাল্লা দিয়ে দুপুরে বাড়ি ফিরতেন। মা'র বকুনির ভয়ে মাকে খুশি করার জন্য ঝটপট রাশি রাশি মটর শাক, সরষে শাক তুলে নিয়ে আসতেন। শাক পেয়ে ছেলের ওপর মা'র সমস্ত রাগ পড়ে যেতো।

মজার ব্যাপার কি জানো ? সীম মটরের খোঁজ পেলে জসীমকে আর ধরে রাখা যেতো না। পাখির মত চঞ্চল হয়ে উঠতো তাঁর মন। বেরিয়ে পড়তেন সারাদিনের জন্য, চষে বেড়াতেন এ ক্ষেত থেকে সে ক্ষেত, সে ক্ষেত থেকে এ ক্ষেত। প্রাণভরে তুলে নিতেন মটর সীমগুলো।

সুবোধ বালকের মত বসে বসে ঢিল দিয়ে গড়ে তুলতেন নকল দালান। সে দালান আগুনে পুড়িয়ে রূপ দিতেন শহরের। এতে তাঁর খুব আনন্দ হতো। আনন্দ আরও একটু বাড়ানোর জন্য হাঁড়িতে সীম সিদ্ধ করে গ্রামের লোকদের বিলিয়ে দিতেন। নিজেও খেতেন পরম তৃপ্তির সাথে।

সারাদিন হৈ-চৈ করে ছোট্ট জসীম বাড়ি ফিরতেন। বাড়িতে ফিরে যদি জানতে পেতেন খাবারের ভালো তরকারি নেই, তাহলে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। শুরু হতো হাঁড়িপাতিল ভাঙচুর, তবুও কিন্তু মমতাময়ী মা ছেলেকে আদর করে ডেকে বলতেন, জসীম! রাগ করিসনে বাবা, খেতে বস। কাল ভালো তরকারি রাঁধবো। মা'র ডাকাডাকিতে তাঁর মনটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসতো। তখন ধীরস্থিরভাবে খেতে বসতেন। রাগ কমে এলে ভাবতেন, বোধ হয় মার সাথে রাগ করা ঠিক হয়নি।

মাঝে মাঝে ছোট্ট জসীম কি করতেন জানো ? এ বাড়ি ওবাড়ি খোঁজ-খবর নিতেন কোন্ বাড়িতে মুড়ি ভাজা হচ্ছে। যে বাড়িতে মুড়ি ভাজা হচ্ছে, তখনই এক ছুটে সে বাড়িতে হাযির হয়েই কোঁচ পেতে দিয়ে বলতেন, কাকী! মুড়ি দাওতো, দেরি করতে পারবো না। কবি বড় হয়েও স্বভাবটাকে অপরিবর্তিত রেখেছিলেন। তাই অনেক সময় গ্রাম্য বধূরা বলতেন, 'জসীম তুই বড় হলি ঠিকই, কিন্তু তোর স্বভাবটা বদলালো না।' সত্যিই কবির স্বভাব বদলায়নি।

facebook/@maktabatuttalamij

হানিফ মোল্লার সাথে কবি

হানিফ মোল্লা নামে কবিদের গ্রামে এক ধনীলোক ছিলেন। চারদিকে তাঁর বেশ নামডাক। লোকেরা তাঁকে নৌকার মহাজন বলে ডাকতো। এই হানিফ মোল্লার পরিবারের সাথে কবি পরিবারের বেশ অন্তরঙ্গ ভাব ছিলো। হানিফ মোল্লার এক ছোট ভাই। নাম তার কানু মোল্লা। হঠাৎ করে একদিন কানু মোল্লা মারা গেলো। সেই থেকে হানিফ মোল্লা জসীমের বাবাকে আপন ভাইয়ের মতই স্নেহ করতেন। সে কারণেই জসীম তাঁর কাছ থেকেও যথেষ্ট স্নেহ-ভালবাসা পেতেন। জসীম যখনই তাঁদের বাড়িতে যেতেন, না খেয়ে ফিরতে পারতেন না।

হানিফ মোল্লার বাড়ি কবির কাছে বেশ রহস্যময় মনে হতো। তার মূলে ছিল তাঁর একখানা বড় নৌকা। সেই নৌকায় করে ব্যবসায়ীরা ব্যবসার কারণে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতো। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে যখন নদীতে পানি দেখা দিত বচনমোল্লা বেপারী তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নদী থেকে নৌকা তুলে সাত-আটদিন ধরে তা মেরামত করতেন আর খোশগল্পে মেতে থাকতেন।

তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কাযেম ফকির ছিলেন বয়সে বড়। তিনি খুব মজার মজার গল্প বলে আসর জমিয়ে তুলতেন। গল্পের প্রতি জসীমের ছিলো বেশ-দুর্বলতা। সে কারণেই তিনি প্রতিদিন তাঁর গল্পের আসরে অংশ নিতেন। গল্পে গল্পে কাযেম ফকিরকে তাঁর ভালো লাগতে লাগলো।

কাযেম ফকির বিভিন্ন দেশ-গ্রামের মজার মজার গল্প শোনাতেন। একদিন কাজের ব্যস্ততার মাঝে সবাইকে কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেওয়ার জন্য তাঁর বাণিজ্য জীবনের একটি ঘটনা শোনান।

"আমি একদেশে গিয়ে দেখি মেয়েলোকেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে এবং হাটবাজারও করে। এভাবে যেতে যেতে অন্য আরেক দেশে এসে উপস্থিত হলাম। তখন

facebook/@maktabatuttalamij

প্রায় দুপুর। ভাত-রান্নার সময়। চাল ঝাড়তে হচ্ছে অথচ সাথে কোন কুলো নেই। তখন কি করি? চাল যে ঝাড়তেই হবে। তাই এক সঙ্গীকে বললাম, কাছের কোন বাড়ি হতে একখানা কুলো নিয়ে আস। সঙ্গী দৌড়াতে দৌড়াতে এক বাড়িতে গিয়ে একটি মেয়েকে বললো, 'মা! তোমাদের কুলোখানা দাওতো। চাল ঝেড়েই ফেরত দেবো।' ঐ কথা শুনেই মেয়েলোকটি ভীষণ চটে গেল। ঝাঁটা উঁচিয়ে তেড়ে এলো আর বললো, 'কি! আরে গোলামের বেটা গোলাম, তুই আমাকে তোর বাপের বউ বানাইলি কোন সাহসে।"

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরলো সঙ্গী। তখন অন্য কোন পথ না দেখে আমি নিজেই মেয়েটির কাছে গিয়ে তাদের আঞ্চলিক ভাষার সম্বোধন করে বললাম, "তোর ধাপড়াখানা দে থাপড়াইয়া লই।" মেয়েটি খুশি হয়ে বললো, "আয় আয়! লইয়া যা।" এই গল্পের মধ্যে কি বুঝলে, "এক দেশের গালি অন্য দেশের বুলি।" আর হ্যাঁ এ ধরনের গল্প- কাহিনী শুনে কথাগুলো আয়ত্ত করতে জসীম উদ্‌দীনের খুব ভালো লাগতো।

হানিফ মোল্লার কারণেই ঐ আসরে তাঁর একটা বিশেষ কদর ছিলো। হানিফ মোল্লা ছিলো তাঁর পরমাত্মীয়। একবার হলো কি, পানির নীচে থেকে নৌকা ওঠাবার সময় এক কাছিম হানিফ মোল্লাকে কামড় দিলো। সেই ক্ষত স্থানে আস্তে আস্তে 'ঘা' হয়ে গেলো। এই ঘায়ের কারণেই হানিফ মোল্লাকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হলো। তাঁর মৃত্যুতে ছোট্ট জসীমের কচিমন কেঁদে উঠেছিল।

facebook/@maktabatuttalamij

কবিগানের আসরে

কবিগানের প্রতি কবির ভীষণ অনুরাগ ছিলো। এমনকি নিজেও কবিগানের আসরে অংশ নিয়ে খুব আনন্দ পেতেন।

কবির বয়স তখন সাত কি আট বছর। চাচার বিয়ের বরযাত্রী হয়ে তিনি একদিন শ্যামসুদ্দীনপুর গ্রামে যান। গ্রামের বেশিরভাগ বিয়েই কিন্তু রাতে হয়। তাই কবিকে সেখানেই রাত কাটাতে হলো। ভোরে ঢোলের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সকাল প্রায়। ঢোলের আওয়াজে তিনি আর ঠিক থাকতে পারলেন না, তাই অন্যকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, পচ্চর জমিদারের কাছারিতে কবিগানের আসর জমেছে। ঢোলের বাদ্য যতই কানে আসতে লাগলো, হাতছানি দিয়ে কবিগান কবিকে ডেকে নিয়ে গেলো সেই আসরে।

উপস্থিত হয়ে কবি দেখলেন, দু'দল কবি ছন্দপদ ঠিক রেখে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করছে। আসর দেখার পর কবি বিয়ে বাড়িতে ফিরলেন তখন দুপুরের খাবার শেষ প্রায়। তিনি খেলেন কি খেলেন না, সে দিকে খেয়াল নেই। বেরিয়ে পড়লেন। সে মুহূর্তে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে বর-কনেকে নিয়ে বরযাত্রী আগে আগে এগিয়ে চলেছে, গ্রামের বউ-ঝিয়েরা উঁকিঝুকি দিয়ে বর-কনেকে দেখার বৃথা চেষ্টা করছে। খেয়াল নেই কবির। আপন মনে সেই গানের লাইনগুলো বারবার আওড়াচ্ছেন। এভাবে আওড়াতে আওড়াতে এক লাইনের সাথে অন্য লাইনের মিল খুঁজে পেয়েই আনন্দে আপ্লুত হচ্ছেন। বাড়ি ফিরে একই গান বার বার গাইতে শুরু করলে বিরক্ত হয়ে ওঠলো বাড়ির সকলে। এমনি করে সাত-আটদিন কেটে গেলো।

হঠাৎ একদিন মনে পড়লো তাঁতী বাড়ির রহিম মল্লিকের কথা। তাঁর বাড়িতে গিয়ে কবি বললেন, 'চাচা! আমি কবিগান শিখবো।' সেই থেকে শুরু হলো তাঁর কবিগানের চর্চা। কবিগানের আসরের মত নিজেই যম সেজে কবিতা বলা শুরু করতেন। চা

facebook/@maktabatuttalamij

বিপক্ষ হয়ে কবির ভাবী শাশুড়ীকে ঠাট্টা-তামাশা করে তার পালা শেষে করতেন। কবিও নিজ সমর্থন জানিয়ে চাচার শাশুড়ীর রূপের ব্যঙ্গ করে বলতেন, তার নাকটা ছিল মহিষকাঁটার মত, মশায় লাথি মেরে নাক বোচা করে দিয়েছে, কান দুটো ভাঙ্গা কুলোর মত। সেই ভাঙ্গা কানে আবার কোদালের দুল। এমনি করে কবি কবিগানের প্রতি খুব আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন হলো কি, কবি এক কবিগানের প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেন। বিপক্ষদলের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ঘাবড়িয়ে গেলেন। তাঁকে এ বেকায়দা অবস্থায় রক্ষা করলেন এক প্রসিদ্ধ কবিয়াল। তিনি কবির প্রতি সদয় হয়ে তাঁর পক্ষ নিয়ে বিপক্ষদলের প্রশ্নের জবাব দিয়ে নানারকমে তাকে নাজেহাল করে তুললেন। কবির হৃদয় আনন্দে ভরে উঠলো।

কবিগানের প্রতি আকর্ষণ দেখে সে সময়কার এক নামীদামী কবিয়াল, নাম হরি আচার্য, কবিকে তাঁর লেখা দু'টো বইও উপহার দিয়েছিলেন।

প্রথম কবিতার সাধ

জসীম উদ্‌দীন ছিলেন একজন নামীদামী বড় কবি। কিন্তু কি করে তিনি কবি হওয়ার উৎসাহ পেলেন তা তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, শোন সে ঘটনা।

জসীমের বাবা মোঃ আনসার উদ্দীন ছিলেন একজন স্কুল-শিক্ষক। কবিতা পড়া ও লেখার প্রতি বেশ ঝোঁক ছিলো তাঁর। বাবার মত তাঁরও কবিতা লেখার শখ ছিলো। কবি তখন ইশান স্কুলে পড়তেন। শুনতে পেলেন সে স্কুলে খিরোদবাবু নামে একজন পণ্ডিতের আগমন ঘটেছে। কিশোর কবি আরো জানতে পারলেন যে, তিনি পাঠ্য বইয়ের মত করে কবিতা লিখতে পারেন। তাই পণ্ডিতকে দেখার জন্য কিশোরের ক্ষুদে কবিমন উতালা হয়ে উঠলো। একদিন সত্যি সত্যি কবি হাযির হলেন তাঁর বাড়িতে। পণ্ডিত মশাই তাঁকে খুব স্নেহের সাথে বরণ করলেন। নিজের কবিতাগুলো কবিকে পড়ে শোনালেন। কবিও মনোযোগী হয়ে শুনলেন।

কবি বাড়ি ফিরে করলেন কি জান? বাবার ছোটবেলার একটি পুস্তক বের করে একটি কবিতার উপরের লাইন নীচে, নীচের লাইন উপরে বসিয়ে একটি কবিতা লিখে

facebook/@maktabatuttalamij

বন্ধু-বান্ধবের খুব প্রশংসা কুড়ালেন। কিন্তু এক কবিতা আর কতদিন। তাছাড়া বাবার কঠিন কবিতা তো আর নিজ নামে চালানো সম্ভব নয়।

এখন কি উপায়! অবশ্য তাঁর জানা ছিল প্রতি লাইনে চৌদ্দটি অক্ষর এবং লাইনের শেষে শব্দের সাথে পরের লাইনের শেষ শব্দের মিল থাকতে হবে। এভাবে কবিতা রচনা খুব দুঃসাধ্যের ব্যাপার। এতে কবি দমে গেলেন না। শুরু হলো সাধনা, দুর্জয় মুকুট তাঁর জয় করতেই হবে। জয়ও করতে পারলেন বৈ কি। এখন তাঁকে পায় কে? শুরু করলেন বিভিন্ন বিষয়বস্তুর উপর কবিতা রচনা করা এসব কবিতা শুনে অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবেরা বলতো, "এগুলো তোর কবিতা না।" কথা শুনে তিনি ভীষণ রেগে যেতেন। কি করে প্রমাণ করবেন যে, এগুলো তাঁরই লেখা। অবশেষে গুরু পণ্ডিত মশাইর কাছে গিয়ে নালিশ জানালেন। তাঁর কথা শুনে পণ্ডিত মশাই হেসে উঠলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "জসীম সার্থক তোমার লেখা। তুমি একজন কবির মতই লিখতে পারো। একদিন সত্যি সত্যিই তুমি মস্ত বড় কবি হতে পারবে। গুরুর আশীর্বাদ যে বিফলে যায়নি, তাতো দেখতেই পাচ্ছো।" গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হলো তাঁর কবিতা লেখা। সমসাময়িক কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কবিতা রচনা করে তিনি বন্ধুদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি আদায় করলেন। কি শুনলে তো কিভাবে তিনি প্রথম কবিতাগুলো রচনা করেছিলেন।

উত্তম সেবক

ছোটবেলায় জসীমের খুব ইচ্ছা ছিলো একজন সন্ন্যাসী হয়ে সারাজীবন মানুষের সেবা করে কাটিয়ে দেবেন। তখনো তাঁর মধ্যে কবি হওয়ার মনোভাব গড়ে ওঠেনি। সেবা করেই আনন্দ পেতেন। পেতেন পরম তৃপ্তি।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন যে, এক বিধবার ছেলে পা ভেঙে ফেলেছে। শুনে তিনি ব্যথা পেলেন আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাই তিনি ঐ ছেলের এক আত্মীয়ের কাছে খবর পাঠালেন, তাঁকে নিয়ে যেন তাঁর কাছে আসে। তিনি চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। ঠিক কথামত পরের দিন বিধবা মা তার ছেলেকে নিয়ে স্টেশনে এসে হাযির।

facebook/@maktabatuttalamij

কবি আগে থেকেই স্টেশনে অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কবির অবস্থা ছিলো শোচনীয়। তাঁর কাছে একটি পয়সাও নেই। কি করে গরুর গাড়ি ভাড়া দেবেন ? আর কোন উপায় না দেখে জমিদার নন্দন মহাশয়ের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বললেন। নন্দন মহাশয় তখন গাড়ির জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন। জমিদার মহাশয় তৎক্ষণাৎ কয়েকটি টাকা বের করে দিতে দেরী করলেন না। টাকা পেয়ে গাড়ির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে হাসপাতালে ভর্তির সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। এতে কি বোঝা গেলো ? কবি ছিলেন মানবদরদী, পরোপকারী। অন্যের অসুখ-বিসুখে তিনি ছুটে যেতেন সেবা দিতে। সেবাতেই পেতেন পরম আনন্দ। এই ছিল তাঁর সেবাধর্ম।

facebook/@maktabatuttalamij

প্রথম স্কুল যাত্রা

শিশু জসীমকে স্কুলে পাঠানো বেশ অসুবিধে ছিলো। তখন গ্রামে কারো বাড়ি থেকে তেমন কেউ স্কুলে যেতো না। তাছাড়া শাস্তির ভয়ে কবি স্কুলে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত নিতেন না। যখন শুনতেন তাঁর বাবা আগামীকালই তাঁকে ও নেছারকে নিয়ে স্কুলে যাবেন, তখনি কবির মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যেতো। মজার ব্যাপার কি ! দু'ভাই রাতে বসে বসে নানারকম ফন্দি-ফিকির আঁটতেন, কি কৌশলে স্কুলে যাওয়া হতে রেহাই পাওয়া যায়। নেছার ছিল জসীমের আপন চাচাতো ভাই এবং খেলার সাথী। দু'জনে মিলে খুব সকালে বেরিয়ে পড়তেন সারাদিনের জন্য। কোনদিন সাঁতার কেটে আবার কোনদিন কারো আখ ক্ষেতে ঢুকে আখ খেয়ে খেয়ে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। এভাবে আজ এখানে, কাল ওখানে লুকিয়ে থেকে বাবার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করতেন। তাদের ধারণা ছিলো, স্কুলে গেলেই বুঝি শিক্ষকেরা শাস্তি দেয়।

চোরের সাতদিন সাধুর একদিন। ক'দিন আর লুকিয়ে থাকা যায়। একদিন তাঁর বাবা দু'ভাইকে সরষে ক্ষেত থেকে ধরে নিয়ে স্কুলের পানে চললেন, তখন ভয়ে তাদের বুক ধড়ফড় করছিলো। স্কুলে যাবার পথে ছিলো একটি বাঁশের সাঁকো। সাঁকোটি পার হওয়ার সময় তাঁদের মনে হচ্ছিল, যেন পুলসিরাত পার হচ্ছে। পথ চলতে চলতে পৌঁছলেন সীতানাথের বৈঠকখানার পাঠশালায়। পৌঁছে সেখানে জসীমের প্রথমেই চোখ পড়লো সাজাপ্রাপ্ত ছেলেগুলোর ওপর। ভয়ে আঁতকে উঠলেন। কিন্তু মাস্টার মশাই জসীমের বাবাকে দেখে সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে জসীমের বাবার আলাপ-আলোচনার পর তাঁদের তিনি ভর্তি করে দিয়ে চলে গেলেন। মুহূর্তেই মনের সব দুর্বলতা কেটে গেলো। মাস্টার মশাইও তাঁদেরকে স্নেহের সুরে বললেন, আগামীকাল থেকে খাতা-কলম নিয়ে স্কুলে এসো। শিক্ষকের স্নেহবাক্য শুনে স্কুলের প্রতি তার মনের বিতৃষ্ণা অনেকটা দূর হয়ে গেলো। পরের দিন থেকে শুরু হলো কবির স্কুল যাত্রা।

facebook/@maktabatuttalamij

“এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।”

কবিতাটির প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দীনেশ চন্দ্রের দৃষ্টি পড়ে। দীনেশ চন্দ্র কবির কবিতাটির মন্তব্য করে লিখেছিলেন, “তোমার কবিতা আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। কবিতা পড়ে আমি কেঁদেছি।” দীনেশ চন্দ্রের স্বীকৃতি পেয়ে কবি আনন্দে আত্মহারা, উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত—কবি লেখনীর হাল ধরে তরতর করে এগিয়ে চললেন সাহিত্যের সাগরে।

দীনেশ চন্দ্র প্রশংসা করেই শুধু ক্ষান্ত হননি। তিনি কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং কবিতাটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাস অনুসারে ম্যাট্রিকের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন কবি বি, এ ক্লাসের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায়ই কবিতা পাঠ্যবইয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার নজির আর নেই।

কিন্তু কবি জসীম উদ্‌দীনের বেলায় তাই হলো। কবির সে কি আনন্দ! চারদিক থেকে বাহবা আসতে লাগলো। তিনি নতুন করে অনুপ্রাণিত হলেন। দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললো তাঁর লেখা। রবীন্দ্র-নজরুলের কবিতার পাশাপাশি রচনা করলেন।

“জনম কালো মরণ কালো কালো ভুবনময়
চাষীদের ঐ কালো ছেলে সব করেছে জয়।”

এ ছাড়া ছাত্রাবস্থায়ই রচনা করলেন বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘নকশী কাঁথার মাঠ’, ‘রাখালী’ ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ।

facebook/@maktabatuttalamij

শিক্ষাঙ্গনে

কবির শিক্ষাজীবন শুরু হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামে শোভারামপুরের অম্বিকা পণ্ডিতের পাঠশালায়। পাঠশালাটি একটু দূরে বলে তাঁর যাতায়াতের বেশ অসুবিধে হতো। অবশেষে ফরিদপুর হিতৈষী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঐ স্কুলেই তাঁর বাবা শিক্ষকতা করতেন। শুরু হলো কিশোর জসীমের শিক্ষা সাধনা। এতে করে তাঁর ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে। তাই বলে তিনি স্কুল ছাড়েননি। জেলা স্কুল থেকে ১৯২১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। তারপর ভর্তি হন রাজেন্দ্র কলেজে। ঐ কলেজ থেকেই ১৯২৪ সালে আই, এ পাস করেন। একই কলেজ থেকে ১৯২৯ সালে বি, এ পাস করেন। কিছুটা খামখেয়ালী ও গ্রামবাংলার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কথা পল্লী সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করতে নষ্ট করেন ছাত্র জীবনের কয়েকটি মূল্যবান বছর। বি, এ পাসের পর পরই শিক্ষা স্পৃহা বেড়ে যায়। ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ১৯৩১ সালে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম, এ পাস করেন আর এখানেই সমাপ্তি ঘটে তাঁর শিক্ষা জীবন।

সাহিত্য সাধনায়

ছোটবেলা থেকেই কবি গল্প, কবিতা ভালবাসতেন। আস্তে আস্তে গল্প ও কবিতার প্রতি তিনি খুব ঝুঁকে পড়লেন। তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো সুন্দর সুন্দর কবিতা, গল্প, নাটক ও প্রবন্ধ। এগিয়ে চললেন সৃষ্টির নেশায়। ইতিমধ্যে চারদিকে জসীম উদ্‌দীনের কবি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিলো।

দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কবর'। কবিতাটি ছাপাও হলো তৎকালীন সবচেয়ে পরিচিত পত্রিকা 'কল্লোলে'। তখন কবি রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র। এখানে কবিতাটির চার লাইন দেওয়া গেলো।

facebook/@maktabatuttalamij

পল্লীকবি নামের সার্থকতা

শিশু সাহিত্যের পাশ কাটিয়ে পল্লীকবি পরিচয়টি সবার কাছে গৃহীত হয়েছিলো। হ্যাঁ সত্যি তিনি ছিলেন পল্লীকবি। তাঁর রচনাগুলোর অধিকাংশই ছিলো পল্লীকে কেন্দ্র করে। পল্লীর সহজ-সরল জীবন ও তাদের চাওয়া-পাওয়া পল্লীর মনমাতানো রূপ জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠতো তাঁর রচনাবলীতে। তাইতো তিনি পল্লীকবি।

সত্যিই পল্লীর প্রকৃতির সাথে ছিলো নাড়ীর যোগ। তিনি পল্লীতে বাস করে, পল্লীর মানুষকে ভালবেসে প্রকৃতির সাথে গড়ে তুলেছিলেন নিবিড় আত্মীয়তা। তাই তাঁর লেখায় গ্রাম বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি ধরা দিতো অপরূপভাবে। তাঁর রচনায় গ্রামের মানুষের সমাজ ব্যবস্থা, মারামারি, লাঠালাঠি, হিংসা-বিদ্বেষ, মায়া-মমতা ও ভালবাসা নিখুঁত চিত্র অংকিত হয়েছে। তাঁর লেখনীর মধ্যে পল্লীর মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ- বেদনা যেভাবে তুলে ধরেছেন সেগুলো পড়ে মানুষের মন কাঁদে। পল্লীভিত্তিক কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'নকশী' কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' অন্যতম। তাই বলতে হয় যে, পল্লীকবি হিসেবে তিনি সার্থক।

শিশুদের কবি

কবি জসীম উদ্দীন ছিলেন স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিক। শিশুমনে সাড়া জাগানোর ক্ষমতায় যদি শিশু সাহিত্যের সার্থকতা হয়, তাহলে বলতে হয় তিনি একজন সার্থক শিশু সাহিত্যিক। কবি শিশুদের খুব আদর করতেন ও ভালবাসতেন। তাই তাদের জন্যে লিখেছেন অনেক।

কবি ছিলেন শিশুর মত সহজ-সরল মনের অধিকারী। তোমাদের মত শিশুদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তাই তিনি বয়সের বেড়াটা দূরে সরিয়ে ছড়া কেটে—গল্প বলে শিশুদের সাথে হাস্য-কৌতুকে মেতে উঠতেন। অতি সহজেই হয়ে যেতেন তাদের বন্ধু।

facebook/@maktabatuttalamij

কবি বহু দেশ-বিদেশ সফর করেছেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে-ফিরে বহু ধরনের গল্প, কাহিনী ও রূপকথা সঞ্চয় করে দেশে ফিরতেন। দেশে ফিরে তিনি তার গল্পের থলি উজাড় করে দিতেন শিশুদেরকে। কোন সামান্য ঘটনাকেও বেশ রঙ-চঙ দিয়ে তিনি বর্ণনা করতে পারতেন। তাইতো কবি জসীম উদ্‌দীন আজও শিশুদের মনের মণিকোঠায় বাস করছেন। শিশুদের জন্য কি মজার মজার কবিতা রচনা করেছেন ! নীচের কবিতার পংক্তিটি তারই সাক্ষী বহন করছে।

"আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই
ফুলের মালা গলায় দিয়ে মামার বাড়ী যাই।"

অনেকে তাঁকে কবি বলে শিশুসাহিত্যের থেকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই তিনি সেই মন্তব্যের উত্তরে লিখলেন একটি আধুনিক কবিতা।

"লেখাপড়া শিখবো মাগো কিনবোনা আর গাড়ী
গড়বো নাকো মস্তবড় আকাশ ছোঁয়া বাড়ী
সবার সাথে মিশবো বলে থাকবো সবার মনে
গাছের তলে ঘর বাঁধিয়া মিলবো ভাই ও বোনে।"

'হাঁসু', 'এক পয়সার বাঁশী', 'ডালিমকুমার', ও 'বাঙালীর হাসির গল্প' বইগুলোতে মন-মাতানো কৌতুকরসে ভরপুর। গল্প, কবিতা ও ছড়া উপহার দিয়ে শিশুমন জয় করে নিয়েছেন। তিনি শিশুদের যেমন রূপকথা বলে আনন্দে মাতিয়ে রাখতেন, তেমন আবার বাস্তবের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'এক পয়সার বাঁশী' বইখানা থেকেই তা বোঝা যায়। সেখানে আসমানীর মত মেয়েদের কথা বলেছেন। যাদের ক্ষুদে বুকের মাঝে বাজতো অভাবের কান্না। আনন্দ কি জিনিস বুঝতো না বা চিনতো না। এগুলো পড়ে কচি কচি শিশু মনগুলোর সকল কালিমা মুছে যায়। জেগে ওঠে সহানুভূতির মন ও ভালবাসার মন।

শিশু সাহিত্য রচনা করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। শিশু সাহিত্য রচনা করতে গেলে শিশুমন বিশারদ হতে হয়। শিশুদের সাথে মিশতে হয়। তাদের জানতে হয় ও বুঝতে হয়। তবেই সার্থক শিশু সাহিত্য রচনা করা যায়। জসীম উদ্‌দীন ছিলেন সেই জ্ঞানে ভরপুর। সে কারণেই তিনি জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক অর্থাৎ শিশুদের প্রিয় কবি।

facebook/@maktabatuttalamij

কর্মজীবন

১৯৩১ সালে এম, এ, পাস করার পর পরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রামতুন লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের বাউল সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা শুরু করেন। এ কাজ শেষ করে ঢাকায় আসেন। ১৯৩৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এগিয়ে যান মহান শিক্ষকতা পেশায়। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগে প্রচার কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। দেশ ভাগ হওয়ার পর অতিরিক্ত প্রচার সংগঠক হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উপ-পরিচালক পদে উত্তীর্ণ হন। ১৯৬১ সালে তিনি সরকারী চাকরি হতে অবসর নেন।

নজরুলের সাথে

নজরুল ছিলেন বিদ্রোহী কবি। অপরদিকে জসীম উদ্‌দীন ছিলেন পল্লীকবি। প্রথম পরিচয়ই তাঁরা একে অপরকে ভালবেসে ফেলেন। দু'জন দু'জনের হলেও স্বভাবে দু'জনই কবি। তাই উভয়ের মধ্যে সাহিত্যিক আত্মীয়তা থাকাটা স্বাভাবিক ছিল।

নজরুলের বাসায় তিনি মাঝে মাঝে যেতেন। নজরুলের মেজো ছেলের মৃত্যুর পরপরই নজরুল মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময়ে তাঁর পাশে পাশেই থাকতেন। এমনকি জীবনের শেষপ্রান্তেও তাঁকে দেখতে যেতেন। তাই নজরুলকে তিনি কখনোই ভুলেননি।

facebook/@maktabatuttalamij

প্রথম শিশু কবিতার বই

কবি শিশুদের জন্য কয়েকটি বই লিখেছেন। তার মধ্যে প্রথম শিশুদের জন্য যে বইটি লিখেছেন তার নাম হচ্ছে 'হাঁসু'। হাঁসু বইটির রচনা প্রসঙ্গে একটি সুন্দর গল্প আছে।

কবি একবার ভারতে শান্তি নিকেতনে বেড়াতে যান। সেখানে বিশ্ব ভারতীয় গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাসায় উঠেন। ওখানে তিনি কয়েকদিন থাকেন। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ওখানে বেশ গল্পের আসর জমে ওঠে। সে সময় সেখানে হাঁসু নামে একটি মেয়ের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। হাঁসুর মলিন মুখখানি কবিকে খুব ব্যথা দিলো। কবি ভাবলেন, কি করে এ শিশুকে খুশি করা যায়। কবি ভেবে ভেবে বের করলেন— ছড়া কেটে, মজার মজার গল্প বলেই হাঁসুর মলিন মুখখানি হাসি-খুশিতে ভরিয়ে তোলা যাবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। শুরু হলো ছড়া ও গল্প বলা। আর আনন্দে মাতিয়ে তুললেন হাঁসুকে। বেশ কিছুদিন এভাবে কেটে গেলো। তারপর কবির বিদায়ের পালা। সেই হাঁসুকে স্মৃতিপটে ধরে রাখার জন্য প্রকাশ করলেন 'হাঁসু' নামে প্রথম শিশু কবিতার বই। এই বই-এ ২৫টি কবিতা ছড়া ও একটি ছড়া-গল্প রয়েছে। যেন ছড়া দিয়ে গাঁথা মালা। এর মাঝে 'হাঁসু' কবিতাটিই শ্রেষ্ঠ।

facebook/@maktabatuttalamij

সাহিত্য মজলিসে

আমাদের দেশে সাহিত্যের উন্নতির জন্য কোন কবি-সাহিত্যিকদের বাসায় তেমন কোন সাহিত্য জলসার ব্যবস্থা নেই। যতটুকু আছে তা পত্রিকা অফিস পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এই অভাবটুকুর অনেকাংশ পূরণ করেছিলেন কবি জসীম উদ্‌দীন। গঠন করলেন 'সাহিত্য সাধনা সংঘ'। ১৯৫৩ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘ ২৩ বছর এই 'সাহিত্য সাধনা সংঘ' পরিচালনা করেছেন।

সাহিত্য সাধনা সংঘের নিয়মিত জলসা বসতো প্রত্যেক রোববার সন্ধ্যায় তাঁর নিজ বাড়িতে। কবির বাড়িটি হচ্ছে কমলাপুরের পলাশবাড়ী। এ সাহিত্য মজলিসে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসতেন খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকগণ। প্রত্যেক জলসায় কোন না কোন নামীদামী কবির সভাপতিত্বে শুরু হতো স্বরচিত কবিতা পাঠ। কবি প্রাণভরে উপভোগ করতেন কবিতা। ডুবে যেতেন তাদের কবিতার মাঝে। মাঝে মাঝে বলতেন, 'আবার শোনাও আমার মন ভরছে না।' গ্রাম থেকেও অনেক কবি আসতেন। তাঁদের কবিতাগুলো সংশোধন করে দিতেন। ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে লেখার সঠিক পথ বলে দিতেন। আর সর্বদা উপদেশ দিয়ে বলতেন "গ্রাম্য ও শহরের সুরকে মিশিয়ে কখনো ভেজাল করো না। ভেজাল খাবার যেমন স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, তেমনি ভেজাল সুরও সাহিত্যের ক্ষতি করে।"

কবিতা ছাপা হওয়ার প্রশ্ন ওঠলে কবি বলতেন, 'সম্পাদকের সাথে যত পরিচয় থাকবে, তত বেশি কবিতা ছাপা হবে। এরাতো সবাই তেলেমাথায় তেল দেয়। আমাদের সময় কিন্তু এমন ছিলো না। আমার 'কবর' কবিতাটি তখনকার সময় অতি পরিচিত নামীদামী পত্রিকা কল্লোলে ছাপা হয়েছিলো। সম্পাদক সাহেবের সাথে আমার কোন পরিচয় ছিলো না। তখন কবিতার দাম দেওয়া হতো। কবি কে, সেটা বড় কথা

facebook/@maktabatuttalamij

বিদেশ সফর

কবি পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। নানান দেশ ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তিনি যে দেশেই গেছেন, সে দেশের মানুষের সাথে মিশেছেন আন্তরিকভাবে। বিনিময় করেছেন মনের ভাব। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন, "আমি যেসব সুন্দর লোকের সংস্পর্শে এসেছি তাদের সাথে অনুরাগ মিশিয়ে নিজকে প্রকাশ করেছি। দেখেছি সকল দেশের মানুষ এক।" তাই কবি বলেছেন ঃ

"নানান রঙের গাভীরে ভাই একই রঙের দুধ
জগৎ ভর মিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।"

তিনি বলেছেন, মানুষকে যারা ভালবাসেন, পরিচয়ের সীমার বাইরে থেকে মানুষের সাথে মিতালী গড়তে চান, আমার পুস্তক পড়ে তাঁরা তৃপ্তি পাবেন। কবি আমেরিকা ভ্রমণ কাহিনীতে একজন আমেরিকান শিক্ষা বিভাগের সম্পাদকের সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছেন যে, গরমের ছুটিতে মেয়েরা হোটেলে পরিচারিকার কাজ করে থাকে। তাই তারা এত উন্নত।

রাশিয়া ভ্রমণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিহত সেনাদের কবরের কাছে গিয়ে আপ্লুত হয়ে একটি কবিতা লিখেছেন ঃ

"রক্ত লেখায় লিখিত হেথায়
জীবনের জয়গান
চিত্রিত এক অমর কাহিনী
উজ্জ্বল অম্লান।"

তাঁর কবিতার মধ্যে জীবনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে জাতিভেদ মুছে গেছে। সাদা-কালো একাকার। প্রকাশ পেয়েছে মানুষ সবার উপরে। তাইতো কবির সুনাম-সুযশ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-বিদেশে।

facebook/@maktabatuttalamij

নয়। কবিতার মান কেমন, সেটাই ছিলো বড় কথা। বর্তমানে দাম দেওয়া হয় কবির। যাক দুঃখ করো না। সাধনাই বড় কথা। লেখার মূল্য একদিন পাবেই। সমুদ্রের ঢেউ যেমন আটকিয়ে রাখা যায় না, তেমনি সাহিত্য প্রতিভা চাপা দিয়ে রাখা যায় না। ডানে-বামে না তাকিয়ে এগিয়ে চল শুধু সামনে দুর্বার গতিতে।' কবি এমনি করে উৎসাহিত করতেন, অনুপ্রাণিত করতেন বিভিন্ন লেখককে। তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে নব উদ্যমে লেখা শুরু করতেন। আসলে বোঝাতে চেয়েছেন সৃষ্টি করাটাই বড় কথা। প্রতিদানে কি পেলো না পেলো তা বড় কথা নয়।

চিরবিদায়

কবি ছিলেন ফুলের মত মানুষ। ফুলফুটে। সৌরভে চারদিক মৌ মৌ করে। সন্ধ্যাবেলা সে ফুল ঝরে পড়ে। "ফুল ফুটে ঝরে যায়, মানুষ আসে চলে যায়।" কবির জীবনেও সন্ধ্যা নেমে এলো। হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। থেমে গেলো তাঁর লেখনী ক্ষমতা। ভর্তি হলেন পি.জি. হাসপাতালে। সেখানে বেশ কিছুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করে সবকিছুর ইতি টেনে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে কবি চিরবিদায় নিলেন। ঘুমিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় কবি। কবি ঘুমিয়ে আছেন তাঁর প্রিয় ডালিম গাছের তলে।

ইফাবা-২০০০-২০০১—প্র/৫৭৮০(উ)—৫২৫০

facebook/@maktabatuttalamij

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij